কবিপ্রিয়া মৃণালিনী

মীনাক্ষী সিংহ

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

ঠাকুরবাড়ির ছোটোবউ, রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি'—মৃণালিনীদেবীকে নিয়ে আমার ভাবনার একটি আলেখ্য 'কবিপ্রিয়া মৃণালিনী'।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম সার্ধশতবর্ষ সদ্য অতিক্রান্ত। তাঁর কাছের প্রিয়জনদের নিয়ে বহু আলোচনার মাঝে কবিপত্নী কিন্তু প্রায় অনালোচিত ও অনালোকিত।

কবির জীবনসঙ্গিনী, অন্তরবাসিনী, অন্তঃপুরচারিণী মৃণালিনীদেবী স্নিগ্ধ সুরভির মতো মিলিয়ে ছিলেন তাঁর স্বামীর জীবনে।

তাঁর অকাল প্রয়াণের পর তাঁর স্মরণে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

যতদিন কাছে ছিলে বলো কী উপায়ে
আপনারে রেখেছিলে এমন লুকায়ে?

রবিকিরণে আলোকিতা মৃণালিনীকে ঘিরে আমার মনে অনেক ভাবনা জমেছিল। হয়তো নতুন কথা লিখিনি, নতুনভাবে ভেবেছি মাত্র। আমার সেই অনেকদিনের ইচ্ছেকে মুদ্রিত রূপ দিয়েছেন 'পুনশ্চ'র কর্ণধার সন্দীপ নায়ক। 'পুনশ্চ' পরিবারের সকলের সঙ্গে সন্দীপকে আমার সকৃতজ্ঞ আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমার ভাবনা পাঠকদের মন ছুঁয়ে গেলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। আর যাঁদের অন্তরঙ্গ জীবন আমার ভাবনার উৎস—সেই বিশ্ববরেণ্য দম্পতির প্রতি রইল আমার বিনম্র প্রণতি।

মীনাক্ষী সিংহ

রবীন্দ্রনাথের জন্মসার্ধশতবর্ষে তাঁকে স্মরণের সঙ্গে মনে আসে তাঁর কাছের মানুষ ও প্রিয়জনদের কথা-ও। এই প্রসঙ্গে সম্ভবত সর্বাধিক অনালোচিত ও অনালোকিত থেকেছেন কবি পত্নী মৃণালিনীদেবী। তাঁর প্রভাব ও প্রেরণাকে নররূপে দেখার মানসে এই প্রতিবেদনের অবতারণা।

ফেলে আসা ২০০২ খ্রিস্টাব্দ ছিল রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনীদেবীর মৃত্যুর শতবর্ষ। তাঁর জন্ম ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ, বিবাহ ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ এবং মৃত্যু ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ। তাঁর জন্মশতবর্ষ যেমন নিঃশব্দে চলে গেছে, তেমনি নিঃশব্দে কেটে গেছে তাঁর প্রয়াণ শতবর্ষ। অথচ, রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী হিসেবে দেশব্যাপী সাহিত্যরসিকদের কাছে বোধহয় তাঁর প্রাপ্য ছিল কিছু বেশি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একচল্লিশ বছর বয়সে স্ত্রীকে হারিয়ে জীবনের শেষ উনচল্লিশ বছর একক জীবন কাটিয়েছেন। স্বল্পকালীন (উনিশ বছর) দাম্পত্য জীবনের পর সংসারে তিনি ছিলেন একা। ১৯০২-এর নভেম্বরে স্ত্রীর অকালমৃত্যুর ত্রিশ বছর পরে আর এক নভেম্বরে স্মৃতিমগ্ন কবি 'পূরবী' কাব্যের 'কৃতজ্ঞ' কবিতায় লিখেছেন—

বলেছিনু—'ভুলিব না', যবে তব ছলছল আঁখি
নীরবে চাহিল মুখে। ক্ষমা করো যদি ভুলে থাকি।

তিনি যে ভোলেননি, এই স্মৃতিমেদুর ক্ষমাপ্রার্থনায় সেই সত্যই উচ্চারিত। কিন্তু রবীন্দ্রঅনুরাগী বঙ্গবাসীরও মৃণালিনীদেবীকে বিস্মরণের জন্য আজ তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার সময় এসেছে। ১২৯০ বঙ্গাব্দের ২৪ অগ্রহায়ণ (ইং ৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩) পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) খুলনার দক্ষিণডিহির ফুলতলি গ্রামের বেণীমাধব রায়চৌধুরীর কন্যা ভবতারিণী জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠপুত্র রবীন্দ্রনাথের পত্নী হয়ে এলেন। বাইশ বছরের তরুণ কবির বালিকাবধূর বয়স তখন দশ।

স্ত্রীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বয়সের ব্যবধান নিয়ে অনেক কথা বলা হয়; কিন্তু যেটি অনুক্ত থাকে সেই তথ্য হল এই যে সেযুগে এই ব্যবধান ছিল খুবই স্বাভাবিক। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতেই তার নজির অনেক আছে। রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সতেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল—তাঁর পত্নী জ্ঞানদানন্দিনীর বয়স তখন সাত বছর। নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উনিশ বছর বয়সে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন নয় বছরের বালিকা কাদম্বরীর সঙ্গে। সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ সে যুগের তুলনায় বেশি বয়সে বিবাহ করেন; তাঁর একত্রিশ বছর বয়সে বিয়ে হয় মহর্ষির শেষ জীবনের প্রিয় অনুচর প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর কন্যা সংজ্ঞাদেবীর সঙ্গে —তার বয়স তখন বারো। এই বয়সের ব্যবধান এঁদের দাম্পত্য জীবনে কোনো বাধা বা ব্যাঘাত সৃষ্টি করেনি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ীদেবীকে বলেছিলেন —'আধুনিকভাবে আমাদের বিবাহ হয়নি তো, তাতে কিছুই এসে যায়নি। একটা গভীর শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল।'

রবীন্দ্রনাথের শ্বশুরমহাশয় বেণীমাধব রায়চৌধুরী ছিলেন জোড়াসাঁকোর কাছারির এক কর্মচারী। তিনি ছিলেন পিরালী ব্রাহ্মণ। ঠাকুরবাড়ির বেশিরভাগ বৈবাহিক সম্পর্ক হতো এই

পিরালী বংশের সঙ্গে। তার ওপর ঠাকুরবাড়ির বধূরা অনেকেই ছিলেন যশোরের মেয়ে। জ্ঞানদানন্দিনীদেবী এবং অবনীন্দ্রনাথের মা ছিলেন যশোরের কন্যা। সুতরাং পিরালী বেণীমাধব রায়চৌধুরীর কন্যার সঙ্গে পিরালী-কুশারী রবীন্দ্রনাথের বিয়ে কৌলিক ঐতিহ্য মেনেই হয়েছিল।

তবে রবীন্দ্রনাথ বিবাহের পূর্বে ভাবী পত্নীকে দেখেছিলেন কিনা এ বিষয়ে মতভেদ আছে। ইন্দিরা দেবী লিখেছেন—

> যশোর জেলা সেকালে ছিল ঠাকুর বংশের ভবিষ্যৎ গৃহিণীদের প্রধান আকর। ...পূর্ব প্রথানুসারে রবিকাকার কনে খুঁজতেও তাঁর বউঠাকুরানীরা, তার মানে মা আর নতুন কাকিমা, জ্যোতিকাকামশায় আর রবিকাকাকে সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যশোর যাত্রা করলেন। বলাবাহুল্য আমরা দুই ভাইবোনেও সে যাত্রায় বাদ পড়িনি। যশোরে নরেন্দ্রপুর গ্রামে ছিল আমার মামার বাড়ি। সেখানেই আমরা সদলবলে আশ্রয় নিলুম।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ীদেবীকে তাঁর বিয়ের গল্পপ্রসঙ্গে বলেছিলেন —'বৌঠানরাই যশোরে গিয়েছিলেন, আমি যাইনি। আমি বলেছিলাম আমি কোথাও যাব না, এখানেই বিয়ে হবে। জোড়াসাঁকোতে হয়েছিল।'

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও ইন্দিরাদেবীর বয়ানেই ভিন্ন সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে। তবে এটা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ বিয়েতে আপত্তি বা অমত প্রকাশ করেননি। বরং নীরব সম্মতিই জানিয়েছিলেন। গ্রাম্য, অসুন্দরী অশিক্ষিত বালিকাবধূকে যে জোর করে রবীন্দ্রনাথের জীবনসঙ্গিনী করা হয়নি এ বিবাহে তাঁর সম্মতি ও অনুমোদন ছিল তা ঠাকুরবাড়ির বিভিন্ন জনের সাক্ষ্যে জানা যায়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রবিকাকার বিয়ের প্রসঙ্গে বলেছেন, তাঁদের বাড়িতে

কবিকে আইবুড়োভাতের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। —'পিসিমারা রবিকাকাকে ঘিরে বসেছেন, এ আমার নিজের চোখে দেখা। রবিকাকা দৌড়দার শাল গায়ে, লাল কি সবুজ রঙের মনে নেই—তবে খুব জমকালো রঙচঙে। বুঝে দেখো, একে রবিকাকা, তায় ওই সাজ, দেখাচ্ছে যেন দিল্লির বাদশা। তখনই ওঁর কবি বলে খ্যাতি; পিসিমারা জিজ্ঞেস করছেন—কীরে বউকে দেখেছিস, পছন্দ হয়েছে, কেমন হবে বউ—ইত্যাদি সব। রবিকাকা ঘাড় হেঁট করে বসে একটু করে খাবার মুখে দিচ্ছেন আর লজ্জায় মুখে কথাটি নেই।'

বোঝা যায় কবি হিসেবে তখনই খ্যাতিমান বাইশ বছরের তরুণ রবীন্দ্রনাথ বিয়ের ব্যাপারে সলজ্জ সানন্দ সম্মতি দিয়েছিলেন। ভাবী স্ত্রীকে নিয়ে কোনো অভিযোগ অসন্তোষ প্রকাশ পায়নি।

২৪ অগ্রহায়ণ ১২৯০ বঙ্গাব্দ (ইং ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ) কবির বিবাহের দিন স্থির হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় বন্ধুদের নিজেই যে আমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়েছিলেন, তা অভিনব, অনন্য ও কৌতুক-পরিহাসে স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল।

প্রিয় বাবু,

আগামী রবিবার ২৪ অগ্রহায়ণ তারিখে শুভদিনে শুভলগ্নে আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ হইবেক। আপনি তদুপলক্ষে বৈকালে উক্ত দিবসে ৬ নং জোড়াসাঁকোস্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহাদি সন্দর্শন করিয়া আমাকে এবং আত্মীয়বর্গকে বাধিত করিবেন।

ইতি—অনুগত শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিজের বিয়ের এই অভিনব আমন্ত্রণলিপি রচনায় রবীন্দ্রনাথের বিবাহকালের সানন্দিত চিত্তেরই পরিচায়ক।

রবীন্দ্রনাথের বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ হেমলতাদেবীর স্মৃতিচারণাতে রবীন্দ্রনাথের বিবাহবাসরের যে বর্ণনা আছে, সেখানে দেখেছি বাসরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতুলন কণ্ঠে গানও গেয়েছিলেন—'আ মরি লাবণ্যময়ী/কে ও স্থির সৌদামিনী'। দুষ্টুমি করে গাইতে লাগলেন নবপরিণীতা স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। বেচারী বালিকা মৃণালিনী রবীন্দ্রনাথের কাণ্ড দেখে জড়োসড়ো ওড়নায় মুখ ঢেকে মাথা হেঁট করে বসে আছেন।

মৃণালিনীর আসল নাম ছিল ভবতারিণী। বিয়ের সময় নামটি পালটে রাখা হল মৃণালিনী। ঠাকুরবাড়িতে এমন ঘটনা নতুন নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী রবীন্দ্রনাথের নতুন বউঠানের নাম ছিল কাদম্বিনী; ঠাকুর পরিবার থেকে সেটি বদলে নাম রাখা হয় কাদম্বরী। ফুলতলির ভবতারিণীর (ফুলি) নতুন নামকরণ মৃণালিনী রাখার পিছনে সাধারণভাবে বলা হয় যে কবির প্রিয় নাম 'নলিনী'-র প্রতিশব্দে এই নামকরণ হয়েছিল; এবং কবির ইচ্ছানুসারে হয়েছিল—এমন মতও শোনা যায়।

কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্য একটি তথ্যও জানা যায়। শোনা যায় (কবির নিজের কথাতেও এর সমর্থন আছে, মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে আলাপচারিতায়) অন্য প্রদেশের ধনী পরিবারের এক কন্যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবাহের প্রস্তাব এসেছিল। শেষ পর্যন্ত সেটি বাস্তবায়িত হয়নি। স্বয়ং কবির কথায় সেই মেয়েটি ছিল 'নেহাৎ সাদাসিধে জড়ভরতের মতো।' সেই কৌতুককর ঘটনাকে অবলম্বন করে তরুণ রবীন্দ্রনাথের বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ 'যৌতুক কি কৌতুক' নামক একটি রঙ্গকাব্য রচনা করেছিলেন। কাব্যের শেষে উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ ঘটনার সম্পর্কটির পূর্ণ আভাস পাওয়া যায়।

—সঁপিছে রবির শিরে, এই আজ আশিসিয়া তারে
অনিন্দিতা স্বর্ণমৃণালিনী হোক,
সুবর্ণ তুলির তব পুরস্কার।

সাত লক্ষ টাকার উত্তরাধিকারিণী মদ্রকন্যার বিতংসে যে বন্দি হননি অনুজ—সেজন্য আশ্বস্ত ও আনন্দিত অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ এই আশীর্বাণী করেছিলেন। বড়োদাদার এই ইঙ্গিত থেকেই বিবাহের দিনে ভবতারিণীর পরিবর্তিত নাম হয়—মৃণালিনী। তবে নামটি যে রবীন্দ্রনাথের অনুমোদিত ও প্রিয়—সে তথ্যও সঠিক এবং মৃণালিনী দেবী, ঠাকুরবাড়ির ছোটো বউ আপনগুণে সেবায় ও মাধুর্যে পরিবারের সকলের প্রিয় পাত্রী হয়ে উঠেছিলেন অল্পদিনেই—হয়ে উঠেছিলেন যথার্থই 'স্বর্ণমৃণালিনী'।

একটি বহু প্রচলিত ও চর্চিত ধারণা এই যে মৃণালিনী ছিলেন গ্রাম্য ও অশিক্ষিত—রবীন্দ্রনাথের অযোগ্য স্ত্রী। কিন্তু তিনি যে ধীরে ধীরে স্বামীর সাহচর্য, প্রেরণা ও প্রভাবে তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী হয়ে উঠেছিলেন তার অনেক নিদর্শন আছে; আছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ, সপ্রেম, সানুরাগ স্বীকারোক্তিতে। কোনো অজ্ঞাত কারণে অথবা অনবধানতাবশত আমরা তা লক্ষ করি না।

কবির বিয়ের ঠিক পরেই মহর্ষি ছোটো বউকে শিক্ষায় দীক্ষায় ঠাকুর পরিবারের উপযোগী করার জন্য লরেটো স্কুলে পড়ার ব্যবস্থা করেন। প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্রের পত্নীর প্রতি মহর্ষি বরাবরই স্নেহশীল ছিলেন। বিবাহের পূর্বে ভাবী পুত্রবধূর জন্য ঠাকুরবাড়ির কর্মচারী সদানন্দ মজুমদারকে দিয়ে ফুলতলিতে রূপোর খেলনা ও বসনভূষণ প্রেরণ করেন। কন্যার পিত্রালয়ে মিষ্টান্ন পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থাও করেছিলেন। ফুলতলির গ্রাম্য পরিবেশ থেকে আগত বালিকা বধূমাতাকে তাঁদের পরিবারের উপযোগী করার